ফুলবাড়ী খনি এবং বাংলাদেশের জ্বালানি রাজনীতি

ওমর ফারুক

বাংলাদেশের জ্বালানি রাজনীতি বিষয়ে আমার আগ্রহ তৈরি হয় ফুলবাড়ীর গণপ্রতিরোধ নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে। ২০০৭ সালের শুরুর দিকে পরিবেশ বিষয়ক সামাজিক আন্দোলনের ওপর একটি গবেষণা প্রবন্ধ লিখতে গিয়ে বিষয়টি আমার নজরে আসে। সে সময় গবেষণার তথ্যসূত্র হিসেবে খবরের কাগজের প্রতিবেদন ও নিবন্ধের ওপরই আমাকে নির্ভর করতে হয়েছে। এরপর ২০০৯ থেকে ২০১৩ সময়কালে তিন দফায় ফুলবাড়ী ও ঢাকায় মাঠ গবেষণা করে আমার আগ্রহের পরিধি আরো বিস্তৃত হয়। আমি ফুলবাড়ীর গণপ্রতিরোধ ও জাতীয় কমিটির আন্দোলনের একজন পর্যবেক্ষক হিসেবে বাংলাদেশের জ্বালানি রাজনীতির নানা দিক পাঠ করি এবং 'পরিবেশ' থেকে মনোযোগ সরিয়ে 'রাজনৈতিক' দিকের প্রতি আগ্রহী হই। কেননা এই গণপ্রতিরোধের 'পরিবেশ' বিষয়ক চর্চা আমার কাছে সংকীর্ণ বলে মনে হয়। যদিও আমার একাডেমিক গবেষণায় স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের জ্বালানি রাজনীতি ব্যাখ্যা করতে আমি রাজনৈতিক সমাজবিজ্ঞানের নানা তত্ত্ব ও প্রত্যয় প্রয়োগ করেছি, এই প্রবন্ধে শুধুমাত্র জ্বালানিক্ষেত্রে পাবলিক পলিসি ও জনগণের প্রতিরোধের জটিল সম্পর্ক নিয়ে কিছু পর্যবেক্ষণ তুলে ধরতে চাই। অনুমান কিংবা প্রোপাগান্ডা নয়, বরং যথাযথ গবেষণাভিত্তিক তথ্য-উপাত্তের নিরিখেই এসব পর্যবেক্ষণ তুলে ধরেছি। জনপরিসরে বাংলাদেশের জ্বালানি খাতের রাজনীতির আলোচনায় কিছু উপকরণ যুক্ত করার মানসে আমার এই লেখা।

১.

২০১৫ সালের ডিসেম্বর মাসে আমি দিনাজপুরের একজন ব্যবসায়ী নেতার সাথে কয়লাখনি ও স্থানীয় ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ে আলাপ করেছিলাম। তাঁর কাছে জানতে চাইলাম যে বড়পুকুরিয়ায় কয়লা উৎপাদনের ফলে স্থানীয়ভাবে এর কী অভিঘাত তিনি দেখতে পাচ্ছেন এবং ভবিষ্যতে ফুলবাড়ীর কয়লা উত্তোলিত হলে এর অভিঘাত কেমন হবে। তাঁর মতে, 'খনির ফলে জ্বালানি সমস্যার হয়তো সমাধান হবে। আমাদের জ্বালানি সংকটের চিন্তা থেকে কয়লাখনি হচ্ছে বা হবেই– ব্যবসায়ীদের এটাই ধারণা। কিন্তু আমাদের এখানে শিল্প/কল-কারখানা কৃষিভিত্তিক কাঁচামালের ওপর নির্ভরশীল। তাই খনি করতে গেলে আমাদের যদি কৃষিজমির তি হয় তাহলে ক্ষুদ্র/মাঝারি যেসব শিল্প এই অঞ্চলে আছে তা কাঁচামালের অভাবে ধ্বংস হয়ে যাবে– এটাও আমাদের ভাবাচ্ছে।' তিনি আমাকে ফুলবাড়ীর প্রতিরোধ বিষয়ে স্থানীয় ও জাতীয় সংগঠকদের নানা দাবি ও মতামতের সমর্থনে একটা ব্যাখ্যা প্রদান করলেন। কেন স্থানীয় মানুষ প্রতিরোধ করছে এবং জাতীয় কমিটির কর্মীরা এতে সম্পৃক্ত হয়ে প্রতিরোধকে আরো বেগবান করেছেন তা আমাকে জানালেন।

আমি উপর্যুক্ত মন্তব্যের প্রথম বিষয় নিয়ে তাঁর কাছে বিস্তারিত জানতে চাইলাম। অর্থাৎ কিভাবে কয়লা উত্তোলন জ্বালানি সংকট সমাধানে ভূমিকা রাখবে? তিনি বললেন, কয়লা উত্তোলনের পর তা দিয়ে বিদ্যুৎ তৈরি হবে; বিদ্যুতের সরবরাহ বাড়লে তাঁদের ঐ অঞ্চলে শ্রমভিত্তিক শিল্প হবে এবং বেকার লোকজনের কর্মসংস্থান হবে। আর উদ্যোক্তাদের উৎসাহ দিলে নীলফামারী ইপিজেডের মতো শিল্পায়নও হতে পারে। অর্থাৎ বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহের যে আকাড়া তার সাথে জড়িয়ে আছে স্থানীয় উন্নয়ন ও ব্যবসা-বাণিজ্য। এবার আমি তাঁকে ফুলবাড়ী খনি প্রস্তাবনার সাথে জড়িত কোম্পানির প্রতিবেদন[১] এবং অন্যান্য সূত্র, বিশেষ করে এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের প্রতিবেদন[২] থেকে কিছু তথ্য উল্লেখ করে তাঁর মন্তব্য জানতে চাইলাম। কোম্পানির প্রতিবেদন অনুযায়ী বছরে ১৫ মিলিয়ন টন কয়লা উত্তোলন করে ১২ মিলিয়ন টন কয়লা বিদেশে রপ্তানি করা হবে। তিন মিলিয়ন টন কয়লা স্থানীয় ব্যবহারের জন্য রাখা হবে। প্রচলিত হিসাব অনুযায়ী তিন মিলিয়ন টন কয়লা দিয়ে ১০০০ মেগাওয়াটের কম বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায়। তবে বাংলাদেশে ইটভাটা ও অন্যান্য কাজে প্রতিবছর প্রায় তিন মিলিয়ন টন কয়লা লাগে। সেই চাহিদার কিছু অংশ মেটালে ৫০০-৬০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন হতে পারে। দিনাজপুরের এই ব্যবসায়ী নেতা বললেন, 'আপনি যে পরিসংখ্যানটা দিলেন, এটা যদি ঠিক হয়ে থাকে তাহলে [খনি] করা ঠিক হবে না। আমার জমি ধ্বংস করলাম, পরিবেশ ধ্বংস করলাম, পানি ধ্বংস করলাম। এসব ধ্বংস করে আমি যে কয়লা পেলাম তার ১২ মিলিয়ন টন বাইরে পাঠিয়ে দিলাম! এখন তো আমরা ২৫০ মেগাওয়াট পাচ্ছি [বড়পুকুরিয়া থেকে]। এত বড় একটা ধ্বংসযজ্ঞ করে আমি মাত্র ৫০০-৬০০ মেগাওয়াট পাব– এটা তো ঠিক না। তাহলে এই চুক্তি ঠিক নেই। আমার কাছে মনে হয়েছে, আমাদের দেশের জন্য ঠিক হয়নি। আমাদের দেশের সম্পদ আরো বেশি পরিমাণে আরেকটা খাতে উৎপাদন করতে পারি; সেখান থেকে আমাদের জিডিপিতে গ্রোথ হলো– তাহলে সেটা ঠিক আছে। আমরা শুধু বাইরে পাঠালাম, কিছু পরিমাণ ট্যাক্স পাব– আমার মনে হয় এগুলোর সংশোধন হওয়া উচিত।'

এই আলাপচারিতায় ফুলবাড়ীর খনি নিয়ে তিনি আরো যা বললেন তা উল্লেখ না করলে ওপরের বক্তব্যের ভিন্ন ব্যাখ্যা দাঁড়াবে। তাঁর মতে, '[খনি কোম্পানির] সাথে যে চুক্তি হয়েছে তা নিয়ে তো বলতে পারব না। তবে আমাদের যে সম্পদ তা তুলে যদি দেশের আর্থসামাজিক অবস্থার পরিবর্তন হয়, ভালো হয়, তাহলে কেন আমি তা তুলব না; অবশ্যই তুলব। পাশাপাশি আমি যেটা বলব যে একটা সম্পদ তুলতে গিয়ে [মাটির] ওপরের সম্পদ নষ্ট করে ফেলি তাহলে তো উপকারে এলো না। পৃথিবী অনেক এগিয়ে গেছে; গবেষণা অনেক এগিয়ে গেছে। সব দিক বিবেচনা করে যেভাবে তা তুললে আমাদের পরিবেশের ভারসাম্য ঠিক থাকবে সেভাবে চিন্তা করে আমাদের এটা করা উচিত। ফেলে রাখার কোনো যোক্তিকতা নেই।' এই পর্যায়ে আমি তাঁকে খনি কোম্পানির বাংলাদেশ অফিসের সিইওর একটা মন্তব্য শোনালাম। ২০০৬ সালের জুলাই মাসে বিবিসির প্রতিবেদকের সাথে আলাপকালে তিনি জানিয়েছিলেন যে মাটির ওপরে উৎপাদিত ধানের চেয়ে মাটির নিচের কয়লার মূল্য অনেক বেশি।[৩] এর জবাবে তিনি বললেন, 'না এই বক্তব্যের সাথে আমি একমত না। উত্তরাঞ্চলের একটা বিশেষ ভূমিকা আছে বিশেষ করে কৃষিপণ্যের ক্ষেত্রে।' এই আলাপচারিতায় উত্থাপিত বিষয়ের আলোকে আমি কিছু পর্যবেক্ষণ তুলে ধরতে চাই ফুলবাড়ীর

গণপ্রতিরোধের গুরুত্ব অনুধাবনের জন্য।

২.

২০১৫ সালের বার্ষিক সম্মেলনে খনি কোম্পানি তার শেয়ারহোল্ডারদের জানিয়েছে যে বাংলাদেশ সরকারের বিদ্যুৎ পরিকল্পনার আলোকে তাদের খনি প্রকল্প অনুমোদনের সম্ভাবনা তারা দেখতে পাচ্ছে; কেননা সরকার কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের দিকে জোরেশোরে এগিয়ে যাচ্ছে। ২০৩০ সাল নাগাদ যে ১৯০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কয়লা থেকে উৎপাদিত হবে তাতে তারা অংশগ্রহণের জন্য উন্মুখ হয়ে আছে। ২০১৫ সালের বার্ষিক প্রতিবেদনে কোম্পানি উল্লেখ করেছে যে তাদের খনি থেকে উত্তোলিত কয়লা দিয়ে ৪০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন হতে পারে। তাই সরকারের পরিকল্পনার সঙ্গে তাদের পরিকল্পনার সামঞ্জস্য রয়েছে বিধায় ফুলবাড়ী খনি নিয়ে একটা ইতিবাচক সিদ্ধান্ত হবে বলেই তারা আশা করছে। এই প্রতিবেদনে ২০১০ সালের বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য গৃহীত মাস্টারপ্ল্যানের তথ্য উল্লেখ করে এই আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়েছে; যদিও এর মধ্যে উক্ত মাস্টারপ্ল্যান বাতিল করে নতুন মাস্টারপ্ল্যান তৈরির কাজ চলছে।[৪] এ নিয়ে আমি পরে আরেকটু আলোচনা করব। পুরো প্রতিবেদনে কিভাবে বাংলাদেশ সরকারের বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনায় ফুলবাড়ী খনি ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারে তা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।[৫]

আমি যে বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই তা হলো উপরোক্ত প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করতে হলে কোম্পানির যাবতীয় দলিল-দস্তাবেজ নতুন করে প্রণয়ন করতে হবে। বাংলাদেশের মিডিয়ায় এবং লন্ডনে বার্ষিক সম্মেলনে যেসব কথাবার্তা কোম্পানির কর্মকর্তাগণ বলে থাকেন তা বাস্তবায়নের জন্য তাঁদের সব ব্যবসায়িক পরিকল্পনা নতুন করে তৈরি করতে হবে। এখানে আমি ধরে নিচ্ছি যে সমস্ত প্রতিরোধ এড়িয়ে বাংলাদেশের সরকার জাতীয় স্বার্থে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য ফুলবাড়ী খনি প্রকল্প উন্মুক্ত পদ্ধতিতে করার অনুমোদন দেবে। কোম্পানির সমস্ত হিসাব-নিকাশ হচ্ছে কিভাবে ফুলবাড়ী খনি অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক করা যায়। এখানে কোম্পানির লাভই মূলকথা– এ বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। বাংলাদেশের বিদ্যুৎ সংকটের সমাধান করে অর্থনৈতিক উন্নয়নে খনি কোম্পানির অবদান রাখার কথা বাতুলতা মাত্র। ২০০৪ সালের নভেম্বর মাসে কোম্পানির এক প্রতিবেদনে যা বলা হয়েছে তা বিবেচনায় নিলে আমার এই মন্তব্যের সমর্থন মিলবে। ২০০০ সালের এক গবেষণার আলোকে কোম্পানি সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে বার্ষিক ৯ মিলিয়ন টন কয়লা উত্তোলন করা হবে; এর ছয় মিলিয়ন টন দিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন হবে আর তিন মিলিয়ন টন অন্যান্য স্থানীয় কাজে ব্যবহার করা হবে। তাহলে দেখা যায়, সেই সময়ের পরিকল্পনা ছিল এমন, যাতে শতভাগ কয়লা বাংলাদেশের স্থানীয় কাজেই ব্যবহৃত হয়।[৬] কিন্তু এই পরিকল্পনা থেকে কোম্পানি সরে এলো ২০০৪ সালের শুরুর দিকে। কোম্পানির ব্যাখ্যা অনুযায়ী, এ ক্ষেত্রে প্রধান প্রভাবক হিসেবে ভূমিকা পালন করেছে ২০০৩ সালের শেষের দিকে ঘটা দুটি বিষয় : ক. আন্তর্জাতিক বাজারে কয়লার দাম ব্যাপক হারে বাড়ে; খ. চীন ও ভারতে কয়লার চাহিদা অনেক বৃদ্ধি পায়। ফলে কোম্পানি কয়লা উৎপাদন বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিল। বার্ষিক উৎপাদন ৯ থেকে বাড়িয়ে ১৫ মিলিয়ন টন করা হলো এবং সিংহভাগ রপ্তানির সিদ্ধান্ত নিল। কেননা রপ্তানির মাধ্যমেই ব্যাপক মুনাফা অর্জন সম্ভব। এই লক্ষ্যে এশিয়া অঞ্চলের কয়লার গ্রাহকদের সাথে দরকষাকষিও চালু করেছে এবং বেশ কিছু গ্রাহক কয়লা কেনার সম্মতি দিয়েছে। লন্ডন স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্তির জন্য প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে একই সময়ে (২০০৪-এর নভেম্বর) সম্ভাব্য বিনিয়োগকারীদের জন্য আয়োজিত এক সম্মেলনে কোম্পানি ফুলবাড়ী খনি সম্পর্কে যে উপস্থাপনা প্রকাশ করেছে তাতে পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে খনি কোম্পানির মূল অবদান হবে বাংলাদেশের জন্য একটি নতুন রপ্তানি খাত তৈরি করা।[৭] সেখানে এটাও বলা হয়েছে যে সমস্ত কয়লা রপ্তানি করা যাবে এবং রপ্তানির জন্য কোনো কর প্রদান করতে হবে না। এ থেকে এ বিষয়টি অনুধাবন করা যায় কেন কোম্পানি গত ১০ বছর (২০০৬-২০১৬) ধরে ঢাকায় অধীর আগ্রহে বসে আছে। খনি বিষয়ক তাদের সমস্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী লাভের অঙ্ক এতই ভারী যে 'সবুরে মেওয়া ফলে'– এই নীতি অবলম্বন করে অপেক্ষা করছে। স্থানীয় জনগণের প্রতিরোধ ও জাতীয় পর্যায়ে সামাজিক আন্দোলনের শক্তিশালী উপস্থিতি থাকলেও বাংলাদেশ সরকারের নীতি প্রণেতাদের মধ্যে খনি কোম্পানির প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন আছে, যা মিডিয়ায় নানা প্রতিবেদনে বিভিন্ন সময়ে উঠে এসেছে। ফলে অপেক্ষায় ক্ষতি নেই!

৩.

এবার আমি আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গে আলোকপাত করব, যা নিয়ে বাংলাদেশে জনপরিসরে আলোচনা খুব একটা চোখে পড়ে না: ফুলবাড়ী খনির প্রস্তাবক কোম্পানি, এশিয়া এনার্জি, কোম্পানি হিসেবে কিভাবে তৈরি হলো? এর তৈরি হবার প্রক্রিয়া জানলে খনি কোম্পানির কর্মপ্রক্রিয়া সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়, যা বাংলাদেশের জ্বালানি রাজনীতির আরেকটি দিক বুঝতে সহায়ক হবে। বাংলাদেশ সরকারের দলিল-দস্তাবেজ অনুযায়ী অস্ট্রেলিয়ার বিখ্যাত খনি কোম্পানি বিএইচপির সাথে ১৯৯৪ সালে খনি অনুসন্ধানের চুক্তি হয়, যার প্রেক্ষিতে ১৯৯৭ সালে তারা ফুলবাড়ী খনি আবিষ্কার করে। খনি আবিষ্কারের পর তারা খনি উন্নয়নে না গিয়ে বাংলাদেশ থেকে তাদের কর্মকাণ্ড গুটিয়ে নেয়। কেন তারা এই সিদ্ধান্ত নিল তা নিয়ে আমি অস্ট্রেলিয়ায় কোম্পানির প্রধান অফিসে যোগাযোগ করে জানতে চাইলে আমাকে বলা হলো যে কোম্পানির আইনি উপদেষ্টার পরামর্শক্রমে এ বিষয়ে আমাকে কোনো তথ্য প্রদান করা যাবে না।[৮] বাংলাদেশ সরকারের জ্বালানি মন্ত্রণালয়ের যে সংস্থা এ বিষয়ে ওয়াকিবহাল থাকার কথা (খনি উন্নয়ন ব্যুরো), তাদের সাথে যোগাযোগ করে আমি জানতে চাইলাম যে বিএইচপি ১৯৯৭ সালে যে প্রতিবেদন সরকারের কাছে জমা দিয়েছে তা তথ্য অধিকার আইনের আওতায় সংগ্রহ করা যাবে কি না। আমাকে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বললেন যে এসব প্রতিবেদন গোপনীয় বিধায় তথ্য অধিকার আইনের আওতায় প্রদান করা যাবে না।[৯] কোম্পানির বাংলাদেশি একজন সাবেক কর্মকর্তা ২০০৮ ও ২০১০ সালে ঢাকার দুটি দৈনিকে প্রকাশিত নিবন্ধে[১০] উল্লেখ করেছেন যে বিএইচপি অস্ট্রেলিয়ার মতো করে পরিবেশ ও অন্যান্য মানদণ্ড মেনে ফুলবাড়ীতে উন্মুক্ত পদ্ধতিতে খনি করতে আগ্রহী না হয়ে খনি আবিষ্কারের পেছনে খরচ করা কয়েক মিলিয়ন ডলার অর্থের মায়া ছেড়ে বাংলাদেশ ত্যাগ করেছে। তাঁর জানার কথা বর্তমানের এশিয়া এনার্জি

জানতে চাইলাম যে বিএইচপি ১৯৯৭ সালে যে প্রতিবেদন সরকারের কাছে জমা দিয়েছে তা তথ্য অধিকার আইনের আওতায় সংগ্রহ করা যাবে কি না। আমাকে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বললেন যে এসব প্রতিবেদন গোপনীয় বিধায় তথ্য অধিকার আইনের আওতায় প্রদান করা যাবে না।

কারা তৈরি করেছে এবং কিভাবে তারা বিএইচপির সাথে সম্পাদিত চুক্তি বাংলাদেশ সরকারের অনুমোদনে হস্তগত করেছে। তিনি এ বিষয়ে কোনো কিছু প্রকাশ করেননি। তাই আমি আগ্রহী হলাম এই ভুঁইফোড় কোম্পানি কী করে বাংলাদেশের জ্বালানি রাজনীতির গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে উঠল।[১১]

প্রথমত. বিএইচপির আর্থিকভাবে কোনো ক্ষতি হয়নি। বিএইচপি যে কারণেই হোক, যখন সিদ্ধান্ত নিল যে তারা বাংলাদেশের প্রকল্প গুটিয়ে নেবে [দালিলিক প্রমাণের অনুপস্থিতির কারণে আমি এখানে অনুমান করে এই কারণ শনাক্ত করতে চাই না] তখন কোম্পানির সিনিয়র অফিসিয়ালদের মধ্যে আলাপ হলো কেউ এই প্রকল্পের মালিকানা নিতে চায় কি না। এই প্রক্রিয়ার ব্যবসায়িক নাম ম্যানেজমেন্ট বাই-আউট। এটি বহুজাতিক কোম্পানির ব্যবসার জগতে অত্যন্ত পরিচিত একটা প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ায় কোনো কোম্পানি তার ব্যবসার একাংশ সিনিয়র অফিসিয়ালদের কেউ আগ্রহী হলে তাঁদের কাছে মালিকানা হস্তান্তর করে; ঐ অফিসিয়ালরা কোম্পানির কাছে প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধার বিনিময়ে উক্ত ব্যবসার মালিক হন এবং তাঁরা স্বাধীনভাবে তা পরিচালনা করেন। এভাবে বিএইচপির এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলে কাজ করেন এমন দুজন সিনিয়র অফিসিয়াল এশিয়া এনার্জি নামে একটা কোম্পানি তৈরি করে অস্ট্রেলিয়ার নিউ সাউথ ওয়েলসে নিবন্ধন করেন এবং বিএইচপির ছত্রচ্ছায়ায় থেকে বাংলাদেশে সরকারের অনুমোদন নিয়ে ফুলবাড়ী খনির চুক্তি হস্তগত করে। এখনো এই নিবন্ধন কার্যকর আছে। পরে খনি খাতে বিনিয়োগ করে এমন একটি অস্ট্রেলীয় বিনিয়োগকারী গোষ্ঠী এর সিংহভাগ শেয়ার কেনে। এই বিনিয়োগগোষ্ঠীর শেয়ারের একাংশ পরে হস্তান্তরিত হয় লন্ডনের আরেক বিনিয়োগগোষ্ঠীর কাছে। উভয়ে মিলে লন্ডনের স্টক একচেঞ্জে অন্তর্ভুক্তির জন্য এশিয়া এনার্জি পিএলসি নামে একটা কোম্পানি তৈরি করে, যার সাবসিডিয়ারি করা হয় অস্ট্রেলিয়ার নিউ সাউথ ওয়েলসে নিবন্ধনকৃত এশিয়া এনার্জিকে। শুরুর দিকে যারা এই কোম্পানির মালিকানার সাথে ছিল তারা কেউ এখন এর সাথে নেই। ২০০৬-এর আগস্টের গণপ্রতিরোধের পর এশিয়া এনার্জি পিএলসির নাম দুইবার পরিবর্তন করা হয়। কিন্তু বাংলাদেশ সরকারের সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় অস্ট্রেলিয়ার নিউ সাউথ ওয়েলসে নিবন্ধনকৃত এশিয়া এনার্জির। তা ঠিক নামেই বহাল আছে। প্রসঙ্গক্রমে এখানে বলে রাখা দরকার যে ফুলবাড়ী খনির প্রস্তাবনার সাথে খনিমূল্যের ৩ শতাংশ অর্থ সরকারি কোষাগারে জমার আইনগত বিধান থাকলেও কোম্পানি তা দেয়নি।[১২] তারা ভবিষ্যতে প্রয়োজনে আর্থিক দায় এড়ানোর একটা পথ এতে তৈরি করে রেখেছে।[১৩]

এভাবে বিএইচপির এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলে কাজ করেন এমন দুজন সিনিয়র অফিসিয়াল এশিয়া এনার্জি নামে একটা কোম্পানি তৈরি করে অস্ট্রেলিয়ার নিউ সাউথ ওয়েলসে নিবন্ধন করেন এবং বিএইচপির ছত্রচ্ছায়ায় থেকে বাংলাদেশে সরকারের অনুমোদন নিয়ে ফুলবাড়ী খনির চুক্তি হস্তগত করে। এখনো এই নিবন্ধন কার্যকর আছে। পরে খনি খাতে বিনিয়োগ করে এমন একটি অস্ট্রেলীয় বিনিয়োগকারী গোষ্ঠী এর সিংহভাগ শেয়ার কেনে। এই বিনিয়োগগোষ্ঠীর শেয়ারের একাংশ পরে হস্তান্তরিত হয় লন্ডনের আরেক বিনিয়োগগোষ্ঠীর কাছে।

এখানে যে বিষয়টির প্রতি আমি গুরুত্ব দিতে চাই তা হলো বাস্তবিক অর্থে ফুলবাড়ী খনির প্রস্তাবক কোম্পানি কোনো খনি কোম্পানি নয়। বাংলাদেশ সরকারের জ্বালানি মন্ত্রণালয়ের কেউ এ বিষয়টা তলিয়ে দেখেননি যে কারা বিএইচপির চুক্তি ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয় হস্তগত করেছে। তারা বাংলাদেশের মূল্যবান খনিজ সম্পদ উত্তোলনের দায়ভার কার ওপর ন্যস্ত করেছে? বাংলাদেশে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার চর্চা থাকলে এ বিষয়ে জানার সুযোগ হতো। ১৯৯৭ সাল থেকে অদ্যাবধি অস্ট্রেলিয়ায় নিবন্ধিত এই কোম্পানির মালিকানা আবর্তিত হয়েছে খনি খাতে বিনিয়োগ করে এমন বেশ কিছু হেজফান্ডের মালিকের মধ্যে। এরা আমেরিকা, দক্ষিণ আফ্রিকা, মালয়েশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, লন্ডন– এসব জায়গায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। এদের কোনো খনি প্রকল্প নেই, কোনো বড় ধরনের ব্যবসার অভিজ্ঞতা নেই। এদের মালিকানার মূল অবলম্বন একটি দলিল– বাংলাদেশ সরকারের সাথে স্বাক্ষরিত চুক্তি। এই চুক্তির শর্ত মোতাবেক আর্থিক লাভের পরিমাণ অনেক বেশি হবার কারণেই নানা দেশের বিনিয়োগকারীরা লাভের আশায় দিন গুনছে। ফুলবাড়ীর মানুষ কিংবা বাংলাদেশের লাভ-ক্ষতির হিসাব নিয়ে তাদের মাথাব্যথা নেই। শুধুমাত্র ফুলবাড়ীর খনি কোম্পানি নয়, বাংলাদেশের জ্বালানি খাতে এরকম আরো বেশ কিছু ভুঁইফোড় কোম্পানি ব্যবসার জন্য রাজনৈতিক যোগসাজশে লোভনীয় বিনিয়োগ প্রস্তাব নিয়ে তৎপর আছে। বাংলাদেশের একজন জ্বালানি বিশেষজ্ঞের মতে এসব অনভিজ্ঞ কোম্পানি নিজেদের দেশের শেয়ারবাজারে ফাটকা কারবারি করার জন্য বাংলাদেশকে গিনিপিগ হিসেবে বেছে নিয়েছে।[১৪]

৪.

খনি কোম্পানি ও তার সহযোগীরা খনির সপক্ষে নানা যুক্তি তুলে ধরবে, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু বাংলাদেশের সরকারকে খনি সম্পর্কিত বিষয়াবলি অত্যন্ত নিখুঁতভাবে বিশ্লেষণ করতে হবে। আর্থসামাজিক, কারিগরি ও পরিবেশগত নানা বিষয়কে একটা কাঠামোর মধ্যে এনে বিবেচনা করতে হবে, আলাদাভাবে নয় এবং এর কোনো একটিকে বেশি প্রাধান্য দিয়ে নয়। এসব পর্যালোচনা অত্যন্ত স্বচ্ছতার ভিত্তিতে হওয়া প্রয়োজন। তবে এখানে যে বিষয়টির দিকে আমাদের নজর দেওয়া দরকার তা হলো, কোনো দেশের সরকার এমনি এমনি এই কাজ করবে তা আশা করা ঠিক হবে না। উন্নত বিশ্ব কিংবা উন্নয়নশীল বিশ্ব–সব ক্ষেত্রে এমনটি দেখা যায়। এজন্য সম্ভাব্য ভুক্তভোগী জনগণ ও অন্যান্য নাগরিক সমাজের আন্দোলনের ফলেই সরকার নড়েচড়ে বসে এবং নানা পদক্ষেপ নিতে উদ্যোগী হয়। এদিক থেকে দেখলে ফুলবাড়ীর প্রতিরোধ একটা অনন্য আন্দোলন। ফুলবাড়ীর স্থানীয় প্রতিরোধ এবং জাতীয় ক্ষেত্রে এর সংগঠকদের নানামুখী কর্মতৎপরতা জ্বালানি বিষয়ে প্রচলিত ডিসকোর্সকে প্রশ্নবিদ্ধ করে নতুন বিকল্প ডিসকোর্স হাজির করতে পেরেছে এবং জনপরিসরে এটি জায়গা করে নিচ্ছে– এটি একটি বড় অর্জন বলা যায়। ফলে ২০০৫-২০১৫ সময়কালে বাংলাদেশের সরকার ধীরে ধীরে ফুলবাড়ী আন্দোলনের মূল বিষয়গুলোর ব্যাপারে ইতিবাচক সিদ্ধান্ত নিতে তৎপর হয়েছে। ধীরগতিতে হলেও অগ্রগতি হয়েছে, এটা আশার সঞ্চার করলেও আশঙ্কা একেবারে নেই তা বলা যাবে না। কেন আশঙ্কা আছে তা ব্যাখ্যার জন্য আমি কানাডার একটি উদাহরণ খুব সংক্ষেপে উল্লেখ করছি।

২০১২ সালে কানাডার অন্টারিও প্রদেশে টরন্টো শহর থেকে কিছু দূরে একটি মার্কিন কোম্পানি পাথর উত্তোলনের জন্য বিশাল আকারের

একটি উন্মুক্ত খনি করতে চেয়েছে। যে অঞ্চলে এই খনি করা হবে তা এই প্রদেশের সবচেয়ে উন্নত কৃষি এলাকা, যেখানে প্রচুর পরিমাণ আলু উৎপাদিত হয়। এলাকাটি আবার টরন্টোসহ আশপাশের এলাকার প্রাকৃতিক পানির উৎসের সাথেও সম্পর্কিত। খনি কোম্পানি কিছু ব্যক্তির কাছ থেকে অল্প পরিমাণ জমি ক্রয় করেছে। জমি কেনার সময় বলেছে যে তারা আলু উৎপাদন আরো বাড়ানোর জন্য বিশাল এক কৃষি প্রকল্প হাতে নিয়েছে। কাউকে জানানো হয়নি যে এই অঞ্চলে তারা পাথর উত্তোলনের জন্য একটি উন্মুক্ত খনি করবে। কিছু জমি কেনার পর কোম্পানি প্রাদেশিক সরকারের কাছে খনির প্রস্তাবনা দাখিল করলে স্থানীয় মানুষ কোম্পানির আসল উদ্দেশ্য টের পেল। স্থানীয় মানুষ (যারা জমি বিক্রি করেছে তারাও) ক্ষুব্ধ হলো এবং প্রতিরোধের নানা উদ্যোগ নিল। বেশ কয়েক মাস ধরে প্রাদেশিক সরকারের দপ্তরে ও জনপরিসরে এ নিয়ে নানা বিতর্ক হলো; কেন এই খনি করা ঠিক হবে না বা কেন এই খনি করা দরকার–এসব নিয়ে আলোচনা চলল। পক্ষে-বিপক্ষে নানা যুক্তির নিরিখে আলোচনা অব্যাহত ছিল। পরিবেশবিদ, পানি বিশেষজ্ঞ, নানা ধরনের অ্যাক্টিভিস্ট গ্রুপ, শহর ও শহরের বাইরের লোকজন এই প্রতিরোধে অংশ নিল। তাদের প্রধান যুক্তি, খনি এলাকা এই অঞ্চলের সবচেয়ে উন্নত ফসলি এলাকা; এখানে উৎপাদিত আলু সারা প্রদেশের চাহিদার সিংহভাগ পূরণ করে।

আরো গুরুত্বপূর্ণ হলো, এই এলাকায় খনি হলে আশপাশের জলধারা দূষিত হবে; ফলে টরন্টোসহ ব্যাপক এলাকায় সুপেয় পানির জোগান হুমকির মুখে পড়বে। এর বিপরীতে খনি কোম্পানির পক্ষেও নানা তৎপরতা চলল। ব্যবসায়ী গ্রুপ ও আরো অনেকে এর পক্ষে যুক্তি হাজির করল। তাদের প্রধান যুক্তি এই– অন্টারিও প্রদেশে অব্যাহতভাবে বাড়ন্ত নির্মাণশিল্পের জন্য যে গ্রানাইট ও অন্যান্য উপকরণ দরকার হবে তার জোগান দেওয়ার জন্য এই খনি অত্যাবশ্যক। অন্টারিওতে নিয়ম অনুযায়ী সরকার খনি কোম্পানির তৈরি করা নানা প্রতিবেদন, বিশেষ করে পরিবেশগত সমীক্ষা প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে প্রস্তাবনা অনুমোদন করে। কিন্তু খনির বিপক্ষে খ্যাতিমান বিজ্ঞানী ও বিশ্বখ্যাত পরিবেশ আন্দোলনের কর্মী ডেভিড সুজুকিসহ আরো অনেক বিশেষজ্ঞ ও অ্যাক্টিভিস্ট জোরালো অবস্থান নেওয়ায় এবং কোম্পানি শুরু থেকেই আস্থার সংকট তৈরি করার ফলে সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে একটি স্বাধীন পরিবেশগত সমীক্ষা প্রতিবেদন তৈরি করে তার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেবে। ফলে কোম্পানির তৈরি করা পরিবেশগত সমীক্ষা প্রতিবেদনের সাথে মিলিয়ে সরকার বিষয়টা ভালোভাবে বুঝতে পারবে। যদিও শুরু থেকে খনি কোম্পানি জোরালো যুক্তি হাজির করেছে; নানা লবিস্ট দিয়ে সরকার ও জনমত প্রভাবিত করার জন্য চেষ্টা করেছে; প্রতিরোধের আকার ও তীব্রতা বাড়ার কারণে তারা ব্যাপক চাপ বোধ করছিল। কোম্পানি বুঝতে শুরু করেছিল যে তাদের খনি প্রস্তাবনা আটকে যাবে বা অনুমোদন পাওয়া বেশ সময়সাপেক্ষ হবে। তবু তারা লেগে থাকল। কিন্তু সরকারের একটি স্বাধীন পরিবেশগত সমীা প্রতিবেদন তৈরির সিদ্ধান্তে কোম্পানি তাদের খনি প্রস্তাবনার ভবিষ্যৎ কী হতে পারে তা অনুধাবন করতে পারল। এই ঘোষণার পরদিন তারা খনির প্রস্তাবনা প্রত্যাহার করে নিল। এর কয়েক দিন পর কোম্পানির সিইও ও চেয়ারম্যান পদত্যাগ করলেন এবং কোম্পানি বিলুপ্ত ঘোষণা করলেন।[১৫]

এবার ফিরে যাই বাংলাদেশের কথায়। অন্টারিওর দুই পক্ষের যুক্তির সাথে ফুলবাড়ী খনি সম্পর্কিত বিতর্ক ও আন্দোলনের মিল আছে। একটা পার্থক্য পাথর ও কয়লা নিয়ে। তবে প্রধান পার্থক্য হলো, বাংলাদেশের মতো অন্টারিওতে সবকিছু গোপনে করা হয় না। প্রাতিষ্ঠানিক কর্মপ্রক্রিয়ার স্বচ্ছতার ক্ষেত্রে দুটি ঘটনায় সরকারের প্রতিক্রিয়ার ফারাক ঠিক যেন উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর মতো। ফুলবাড়ী নিয়ে এশিয়া এনার্জির সাথে সম্পাদিত চুক্তি নিয়ে বাংলাদেশের খনি বিধিমালার আইনি বিধান মেনে কোনো গেজেট জারি হয়নি। ফলে সরকারিভাবে এর অস্তিত্ব স্বীকৃত হয়নি। সাত বছর আট মাস পর ১ জুন ২০০৬ সালে এ মর্মে সরকারি গেজেট প্রকাশিত হয়েছে।[১৬] ফুলবাড়ী খনি নিয়ে পক্ষে-বিপক্ষে ২০০৫ সালের গোড়া থেকে আলোচনা শুরু হয়েছে। এতে বাংলাদেশ সরকারের কী ভূমিকা ছিল? ২০০৬ সালের আগস্টের চূড়ান্ত প্রতিরোধ পর্বের পূর্বে বাংলাদেশ সরকার স্থানীয় জনগণ এবং জাতীয় কমিটির নানা বক্তব্য বলা যায় আমলেই নেয়নি। ১৮ জুন ২০০৫ থেকে ২০ মার্চ ২০০৬ পর্যন্ত ফুলবাড়ীর জনগণ প্রধানমন্ত্রীর কাছে স্থানীয় প্রশাসন মারফত একটি দাবিনামা ১০ বার প্রেরণ করেছে।[১৭] এই দাবির প্রতি স্থানীয় কিংবা কেন্দ্রীয় প্রশাসন কোনো পদপে নেয়নি। এর মধ্যে অবশ্য সেই সময়ে নবনিযুক্ত জ্বালানি উপদেষ্টা খনি কোম্পানির উদ্যোগে একদল সাংবাদিক নিয়ে ১৬ জুন ২০০৫ ফুলবাড়ী অঞ্চলে কোম্পানির অনুসন্ধানকর্মের নানা দিক পরিদর্শন করে। ২০০৬-২০১৬ সময়কালে বাংলাদেশের সরকার ফুলবাড়ী খনি এবং কয়লা বিষয়ে নানা তৎপরতা হাতে নিয়েছে, তার কোনোটিই প্রাতিষ্ঠানিক কর্মপ্রক্রিয়ার স্বচ্ছতার স্বাক্ষর বহন করেনি। সাম্প্রতিক তৎপরতা হলো ২০০৫ সালের জুলাই মাসে শুরু হওয়া জাতীয় কয়লানীতি তৈরির প্রক্রিয়া। গত ১১ বছরে জ্বালানি মন্ত্রণালয় এই নীতি তৈরি করতে পারেনি। এর কারণ নিহিত আছে ফুলবাড়ীর গণপ্রতিরোধের চরিত্রে। ২০১৫-এর শেষের দিকে এই নীতি সম্পাদনের জন্য জ্বালানি মন্ত্রণালয়ের হাইড্রোকার্বন ইউনিটকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।[১৮]

২০০৬ সালের আগস্টের চূড়ান্ত প্রতিরোধ পর্বের পূর্বে বাংলাদেশ সরকার স্থানীয় জনগণ এবং জাতীয় কমিটির নানা বক্তব্য বলা যায় আমলেই নেয়নি। ১৮ জুন ২০০৫ থেকে ২০ মার্চ ২০০৬ পর্যন্ত ফুলবাড়ীর জনগণ প্রধানমন্ত্রীর কাছে স্থানীয় প্রশাসন মারফত একটি দাবিনামা ১০ বার প্রেরণ করেছে।

যে নীতির সাথে ফুলবাড়ীসহ কয়লা অঞ্চলের জনগণের অস্তিত্বের প্রশ্ন জড়িয়ে আছে তা প্রণয়নে জনপরিসরে কোনো আলোচনা নেই। জনপ্রশাসন নিয়ে সেসব একাডেমিক গবেষণা হয়েছে তাতে স্কলারগণ দেখিয়েছেন যে বাংলাদেশের আমলাগণ পাবলিক পলিসি তৈরির ক্ষেত্রে নিজেদের চিন্তাচেতনার বাইরে অন্য কারো প্রভাব, বিশেষ করে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ এবং সিভিল সোসাইটি কিংবা সামাজিক আন্দোলনের দাবি/মতামতকে তেমন গুরুত্ব দিতে আগ্রহী নন।[১৯] কয়লানীতির ক্ষেত্রেও এই মনোভাবের প্রকাশ ঘটেছে।[২০] বাংলাদেশে পাবলিক পলিসি প্রণয়নে আরেক প্রভাবশালী গোষ্ঠী হলো 'উন্নয়ন সহযোগী' নানা সংস্থা।[২১] তারা আমলাদের চিন্তাভাবনায় গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে। জ্বালানি খাতের নীতি নির্ধারণের গতি-প্রকৃতি নির্ধারিত হয় এসব সংস্থার কারিগরি ও আর্থিক সহায়তাপুষ্ট নানা প্রকল্পের শর্তের বেড়াজালে। আশির দশক থেকে যাত্রা শুরু করে অদ্যাবধি এর ব্যত্যয় হয়নি। এই খাতে পাবলিক পলিসির মূল উপাদানের বেশির ভাগের উৎসভূমি এসব সংস্থা প্রণীত নানা 'বিশেষজ্ঞ' প্রতিবেদন।[২২] কয়লা খাতও এর ব্যতিক্রম নয়। ২০০৫ সালের আগস্ট মাসে কয়লানীতি প্রণয়নের দায়িত্ব দেওয়া হয় আইআইএফসি (Investment Infrastructure

Facilitation Center)[২৩] নামক বাংলাদেশ সরকারের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের অধীন একটি সংস্থাকে। ২০০৫ সালের ডিসেম্বর থেকে ২০০৬ সালের এপ্রিল পর্যন্ত এই সংস্থা কয়লানীতির চারটি খসড়া তৈরি করেছে। পরবর্তীতে জ্বালানি মন্ত্রণালয়ের আমলাগণ এর ওপর কাজ করে আরো কয়েক সংস্করণ তৈরি করেছেন। কয়লানীতির প্রথম সংস্করণটি[২৪] 'উন্নয়ন সহযোগী' নানা সংস্থার প্রভাবের মাত্রাটি তুলে ধরে। বাংলাদেশ সরকার ২০০০ সালে বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে 'প্রাইভেট সেক্টর ইনভেস্টমেন্ট ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প'-এর অধীনে আইআইএফসি তৈরি করেছে, যার মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে বাংলাদেশের অবকাঠামো উন্নয়নে বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ ত্বরান্বিত ও উৎসাহিত করা। যুক্তরাজ্য ও কানাডার সরকারি সাহায্য সংস্থাও এতে অর্থায়ন করেছে।

এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্যের আলোকে উক্ত খসড়ায় কয়লা খাতের উন্নয়নে বিদেশি খনি কোম্পানির অংশগ্রহণ ও তার স্বার্থের নানা বিষয় প্রাধান্য পেয়েছে। ঐ খসড়ার শেষে সংযোজিত সারণি থেকে (এনেক্স-এ) এটি পরিষ্কারভাবে বোঝা যায়। এখানে উল্লেখ করা দরকার যে ২০০৬ সালের জানুয়ারি থেকে ২০১৫ সালের আগস্ট পর্যন্ত কয়লানীতির ১১টি সংস্করণ তৈরি হলেও সরকারিভাবে জ্বালানি মন্ত্রণালয় এখনো কোনো জাতীয় কয়লানীতি প্রকাশ করেনি। বাংলাদেশে পাবলিক পলিসির ক্ষেত্রে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এটিকে ফুলবাড়ীর গণপ্রতিরোধের সফলতার একটি দিক হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। জ্বালানি মন্ত্রণালয়ের নীতিনির্ধারকগণ দুটি বিষয়ের মধ্যকার দ্বন্দ্ব সমাধান করতে পারেনি: বহুজাতিক খনি কোম্পানির কর্পোরেট স্বার্থ এবং বাংলাদেশের জাতীয় স্বার্থ। যেহেতু অস্বচ্ছ রাজনৈতিক ও প্রাতিষ্ঠানিক প্রক্রিয়ায় এই খাতের কর্ম পরিচালিত হয়ে আসছে, তাই খনি কোম্পানি আজও অপেক্ষা করছে। এসব বিষয়ে আজ আর কোনো প্রোপাগান্ডার ওপর নির্ভর করতে হয় না। ২০১১ সালে কানাডার আদালতে প্রমাণিত হয়েছে যে বাংলাদেশের জ্বালানি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রীকে ঘুষ দিয়ে গ্যাসক্ষেত্রের চুক্তি করেছে পূর্বে অযোগ্য ঘোষিত এক কানাডীয় কোম্পানি (নাইকো)।[২৫] বাংলাদেশ সরকার সম্প্রতি (২০১৬-এর মে মাসে) বিশ্বব্যাংকের সালিসি আদালত, ইকসিডে মামলা করেছে এই মর্মে যে দুর্নীতির মাধ্যমে কানাডার ঐ কোম্পানি চুক্তি স্বাক্ষর করেছে।[২৬] এখানে উল্লেখ্য, বাংলাদেশের সরকার আর্থিক দণ্ডের মুখোমুখি হয়ে একরকম বাধ্য হয়ে হাঁড়ির খবর প্রকাশ করতে বাধ্য হয়েছে। কেননা নাইকো আগে ইকসিডে মামলা করেছে বাংলাদেশ সরকারের কাছে সুদাসলে ক্ষতিপূরণ চেয়ে এবং আদালত তার পক্ষে রায় দিয়েছেন। অথচ বাংলাদেশ সরকার ঢাকায় স্থানীয় আদালতে নাইকোর বিরুদ্ধে টেংরাটিলা গ্যাসক্ষেত্রে বিস্ফোরণের জন্য ক্ষতিপূরণ চেয়ে মামলা করে দিন গুনছিল। এর মধ্যে নাইকো ইকসিডের মামলায় জেতার কারণে বাধ্য হয়ে পাল্টা মামলার পদপেক্ষ নিতে হয়েছে।

এই আলোচনায় আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো জ্বালানি সম্পদের ব্যবস্থাপনায় প্রাতিষ্ঠানিক প্রক্রিয়া ও দুর্নীতি। ২০০৬ সালের ২৬ আগস্টের পর থেকে অদ্যাবধি খনি কোম্পানি ঢাকায় বহাল তবিয়তে আছে ফুলবাড়ী খনি করার জন্য। এর মধ্যে সরকারের দুটি কমিশন খনি প্রস্তাবনা ও আনুষঙ্গিক বিষয়ে মতামত দিয়েছে ২০০৬ ও ২০১২ সালে।[২৭] ২০১৫ সালের জুলাই মাসে জ্বালানি মন্ত্রণালয় নতুন করে স্টাডি করার দায়িত্ব দিয়েছে ভূতাত্ত্বিক অধিদপ্তরকে।[২৮] কানাডা ও বাংলাদেশের ভিন্ন রাজনৈতিক ও প্রাতিষ্ঠানিক কর্মপ্রক্রিয়া দিয়ে এই ভিন্ন বাস্তবতাকে বিচার করা যায়। সে জন্য আগে উল্লেখ করেছি যে আন্দোলনকারীদের আশঙ্কা দূরীভূত হয়নি। এই আশঙ্কার আরেকটি কারণ হলো গত ১১ বছরের আন্দোলন কয়লা প্রশ্নে পাবলিক পলিসিতে কার্যকর কোনো পরিবর্তন তৈরি করতে পারেনি। অর্থাৎ কয়লা উত্তোলন নিয়ে সরকারি নীতিনির্ধারকগণ নানা সময়ে নানা কথা বললেও (যার কোনোটি খনি কোম্পানির পক্ষে, আবার কোনোটি আন্দোলনকারীদের পক্ষে যায়) সরকারি দলিল-দস্তাবেজে যে অবস্থান তাতে কোনো পরিবর্তন হয়নি। পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের দলিল-দস্তাবেজে এর স্বাক্ষর পাওয়া যায়।[২৯] এতে বলা যায় খনি কোম্পানির সৃষ্ট ডিসকোর্সই গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে এসব দলিলে।

তবে একটা বড় পরিবর্তনের কথা উল্লেখ না করলেই নয়। তা হলো বিদ্যুৎ উৎপাদন বিষয়ক মাস্টারপ্ল্যান একটা বড় ধাক্কা খেয়েছে এই আন্দোলনের ফলে। ২০১০ সালে প্রণীত ২০ বছর মেয়াদি পাওয়ার সেক্টর মাস্টারপ্ল্যান চার বছরের মাথায় বাতিল করে ২০৪১ সাল নাগাদ বিদ্যুৎ পরিকল্পনার দিকনির্দেশনা নিয়ে নতুন মাস্টারপ্ল্যান তৈরির কাজ এখন শেষের দিকে।[৩০] ২০১০-এর মাস্টারপ্ল্যানের মূল স্তম্ভ ছিল যে ২০৩০ সাল নাগাদ বিদ্যুৎ উৎপাদনের ৫০ শতাংশ কাঁচামাল (প্রাইমারি এনার্জি) হবে স্থানীয় কয়লা। ২০১২ সালের সরকারি এক দলিলে বলা হয়েছে, ২০১৪ সালে ফুলবাড়ী এবং ২০১৭ সালে খালাসপীর খনি থেকে কয়লা উত্তোলন শুরু করা হবে।[৩১] ২০১৪ সালে এসে সরকার উপলব্ধি করতে পারল যে মাস্টারপ্ল্যানের ঐ মূল স্তম্ভ বাস্তবায়নযোগ্য নয়। তাই এখন আমদানীকৃত কয়লাকে মূল স্তম্ভ ধরে পরিকল্পনা করা হচ্ছে। এসব পরিবর্তন এমনি এমনি হয়নি। ফুলবাড়ীর প্রতিরোধের একটা বড় ধাক্কা লেগেছে এই গুরুত্বপূর্ণ পাবলিক পলিসি তৈরির ক্ষেত্রে।

৫.

বাংলাদেশে জ্বালানি রাজনীতি বোঝার জন্য খনি কোম্পানির প্রস্তাবনার আরো দুটি দিক আমার কাছে বেশ গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে। এর একটি হলো কয়লা উত্তোলনের আন্ডারগ্রাউন্ড পদ্ধতির অসারতা প্রমাণ করা এবং ফুলবাড়ীর জন্য বৈজ্ঞানিক গবেষণার ভিত্তিতে উন্মুক্ত পদ্ধতি ঠিক করা হয়েছে বলে জনপরিসরে একটা শক্তিশালী মত প্রতিষ্ঠা করা। এ উভয় ক্ষেত্রে কোম্পানি অত্যন্ত সফল হয়েছে বলা যায়। কেননা সরকারি দলিল-দস্তাবেজে এবং বাংলাদেশের মিডিয়ায় এর প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রথমে দেখা যাক আন্ডারগ্রাউন্ড পদ্ধতির অসারতা বিষয়ে। বাংলাদেশে বিশেষজ্ঞ থেকে শুরু করে সাংবাদিক– সবাই খনি কোম্পানির অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে তৈরি একটা ছকে এ বিষয়টা ভাবছেন। ফলে বাংলাদেশে জনপরিসরের আলোচনায় একটা প্রধান বিষয় হলো আন্ডারগ্রাউন্ড পদ্ধতিতে ১৫-২০ শতাংশের বেশি কয়লা উত্তোলন করা যায় না। আমি এ বিষয়ে অনুসন্ধান করতে গিয়ে প্রথমেই দেখলাম, বাংলাদেশে এ নিয়ে যেসব একাডেমিক লেখা আছে তাতে কী পাওয়া যায়। এ বিষয়ে ভূতত্ত্ববিদ ও জ্বালানি প্রকৌশলীদের লেখায় ১৫-২০ শতাংশের কথাই বলা আছে।[৩২] আমি অবাক হলাম। তাহলে বিশ্বের সবচেয়ে বেশি কয়লা উৎপাদনকারী দেশ চীন কেন ৯০ শতাংশের মতো কয়লা আন্ডারগ্রাউন্ড পদ্ধতিতে তোলে? চীন কৃষিজমির স্বল্পতার জন্য কয়লাখনির ক্ষেত্রে আন্ডারগ্রাউন্ড পদ্ধতি অবলম্বন করে। এমনকি কয়লা উৎপাদনকারীদের সংগঠন ওয়ার্ল্ড কোল অ্যাসোসিয়েশনের ওয়েবসাইটেও বলা আছে, বিশ্বে সবচেয়ে বেশি পরিমাণ কয়লা উত্তোলন করা হয় আন্ডারগ্রাউন্ড পদ্ধতিতে এবং এই পদ্ধতির দুটি কারিগরি টেকনিক প্রয়োগ করে ৮০ শতাংশ পর্যন্ত কয়লা উত্তোলন করা যায়। তাহলে বাংলাদেশের একাডেমিক ও জনপরিসরের আলোচনায়

কেন ভিন্নভাবে এটি উপস্থাপিত হচ্ছে? খনি পদ্ধতি খনি এলাকার ভূতাত্ত্বিক গঠনের ওপর নির্ভর করে– এটা বোঝার জন্য রকেট বিজ্ঞানী হওয়া লাগে না।

বাংলাদেশের বড়পুকুরিয়ায় একই কয়লা জোনে আন্ডারগ্রাউন্ড পদ্ধতিতে কয়লা উত্তোলন করা হলেও ফুলবাড়ীতে উন্মুক্ত পদ্ধতিতে তোলার তোড়জোড় শুরু হয়েছিল ২০০৫ সাল থেকে। এর পেছনে তাদের যুক্তি হলো, আন্ডারগ্রাউন্ড পদ্ধতিতে ১৫-২০ শতাংশের বেশি কয়লা উত্তোলন করা যায় না। আমি খেয়াল করলাম, ২০০৫ সালের জুলাই মাস থেকে শুরু করে আজ অবধি বাংলাদেশের সংবাদপত্রে কয়লাখনি বিষয়ক যেকোনো খবরে এই যুক্তিটা প্রায়ই উল্লেখ করা হয়। আমি অনুসন্ধান করতে থাকলাম এই যুক্তির উদ্ভব কোথা থেকে। অর্থাৎ কিভাবে এই নিু উৎপাদন হার একটা মিথ হিসেবে বাংলাদেশে তৈরি হলো। আমি দেখলাম, এর উদ্ভব হয়েছে খনি কোম্পানির মিডিয়া ক্যাম্পেইন স্ট্র্যাটেজি থেকে। ২০০৫ সালের জুন মাসে জ্বালানি মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণ ও সাংবাদিকদের জন্য খনি কোম্পানির স্পন্সরকৃত ফুলবাড়ী সফরের সময় কোম্পানির জেনারেল ম্যানেজার উল্লেখ করেন যে আন্ডারগ্রাউন্ড পদ্ধতিতে কোনোমতে ১০-২০ শতাংশ কয়লা উত্তোলন করা যায়। এই সময়ে খনি কোম্পানি ফুলবাড়ী খনি নিয়ে প্রোপাগান্ডা চালানোর জন্য একটি ডকুমেন্টারি[৩৩] তৈরি করেছে, যেখানে জেনারেল ম্যানেজারের এই বক্তব্য আরো ভালোভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। সরকারি কর্মকর্তা ও সাংবাদিকগণ এই প্রথম এ বিষয়ে জানতে পারলেন।

উল্লেখ্য, ঐ সময়ে বাংলাদেশে কয়লা উত্তোলন তখনো শুরু হয়নি, আর বড়পুকুরিয়া নিয়ে সরকারের তরফ থেকে মিডিয়ার জন্য কোনো প্রচারণাও করা হয়নি। তাই এই সুযোগে খনি কোম্পানির তৈরি ডিসকোর্সই জনপরিসরে ও নীতিনির্ধারণী দলিলে জায়গা পাবে; বাস্তবে হয়েছেও তা-ই। এই পরিকল্পনা অত্যন্ত নিখুঁতভাবে বাস্তবায়নের জন্য খনি কোম্পানি পাশ্চাত্যের এক নামি গবেষণা সংস্থাকে ঢাকায় এনেছে, যারা কয়লা বিষয়ক বিশ্ববাজার গবেষণায় প্রসিদ্ধ। অন্যদিকে বাংলাদেশের মিডিয়ায় জ্বালানি বিষয়ক সংবাদের কাজে নিয়োজিত সাংবাদিকদের সংগঠন ফোরাম ফর এনার্জি রিপোর্টার্সকে খনি কোম্পানি তার মিডিয়া ক্যাম্পেইনের জন্য স্ট্র্যাটেজিক পার্টনার হিসেবে নিয়োগ করে। এ দুই পক্ষকে নিয়ে খনি কোম্পানি ঢাকায় ২০০৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসের শুরুতে 'কোল রিপোর্টিং' বিষয়ক এক কর্মশালার আয়োজন করে। ঐ কর্মশালায় জ্বালানি মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা ও সাংবাদিকগণ অংশগ্রহণ করেন। কর্মশালায় উপস্থিত সাংবাদিকগণই বাংলাদেশের প্রায় সব দৈনিক বা টিভি চ্যানেলে কর্মরত। এখানে কয়লা বিষয়ক সংবাদ পরিবেশনের জন্য খনি কোম্পানির নিয়োগ করা সংস্থা যে 'টকিং পয়েন্টস' আলোচনা করেছে, তা-ই পরবর্তীতে বাংলাদেশের কয়লা বিষয়ক সাংবাদিকতার এবং জনপরিসরে আলোচনার দাপুটে এজেন্ডা হিসেবে দাঁড়িয়েছে। কোম্পানি বড়পুকুরিয়া খনি থেকে আন্ডারগ্রাউন্ড পদ্ধতিতে কয়লা তোলার উদাহরণ টেনে এই হিসাব আরো পাকাপোক্ত করেছে। অথচ শুরু থেকেই বড়পুকুরিয়া খনির ডিজাইন ত্রুটি এবং আরো নানা ধরনের কেলেঙ্কারির কারণে এটা যে আন্ডারগ্রাউন্ড পদ্ধতির আদর্শ উদাহরণ হতে পারে না তা নিয়ে বাংলাদেশের মিডিয়ায় কোনো আলোচনা চোখে পড়ে না। মিডিয়ার বক্তব্য খনি কোম্পানির টকিং পয়েন্টসের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। সম্প্রতি বাংলাদেশের এক সাংবাদিক আলোচনা করেছেন কিভাবে সরকারি দপ্তর এবং দেশি-বিদেশি কোম্পানির নানা চক্রান্তে পড়ে জ্বালানি খাতে কাজ করেন এমন সাংবাদিকগণ পক্ষপাতমূলক সংবাদ করে থাকেন। তাঁর মতে, জ্বালানি বিষয়ক সরকারি দপ্তর এবং দেশি-বিদেশি কোম্পানির মূল লক্ষ্য থাকে নেতিবাচক দিক যাতে কোনোভাবেই জনসমক্ষে হাজির না হয়; এ ক্ষেত্রে মিডিয়াই ভরসা।[৩৪]

> ওয়ার্ল্ড কোল অ্যাসোসিয়েশনের ওয়েবসাইটেও বলা আছে, বিশ্বে সবচেয়ে বেশি পরিমাণ কয়লা উত্তোলন করা হয় আন্ডারগ্রাউন্ড পদ্ধতিতে এবং এই পদ্ধতির দুটি কারিগরি টেকনিক প্রয়োগ করে ৮০ শতাংশ পর্যন্ত কয়লা উত্তোলন করা যায়। তাহলে বাংলাদেশের একাডেমিক ও জনপরিসরের আলোচনায় কেন ভিন্নভাবে এটি উপস্থাপিত হচ্ছে?

এবার তাকাই দ্বিতীয় বিষয়ের দিকে: ফুলবাড়ীর জন্য বৈজ্ঞানিক গবেষণার ভিত্তিতে উন্মুক্ত পদ্ধতি ঠিক করা হয়েছে কি না। গত ১০ বছরে আলোচনা ও বিতর্কে কোম্পানির পে দাবি করা হয় যে ফুলবাড়ীর ভূতাত্ত্বিক গঠনের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের পর একে উন্মুক্ত খনির জন্য উপযুক্ত বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কোম্পানির খনি প্রস্তাবনার প্রতিবেদনে এটি উল্লেখ করা হয়েছে।[৩৫] বাংলাদেশের ভূতত্ত্ববিদ ও জ্বালানি প্রকৌশলীগণ এ বিষয়ে দুই ভাগে বিভক্ত। আমি এই বিভাজনের ফাঁদে না পড়ে কোম্পানির প্রতিবেদন পর্যালোচনায় আগ্রহী হই। এখানে উল্লেখ করা দরকার যে সমাজবিজ্ঞানের ছাত্র হিসেবে আমি কোম্পানির প্রতিবেদনকে একটা ডিসকোর্স হিসেবে ধরে এর অন্তর্নিহিত যুক্তি খোঁজার চেষ্টা করেছি। কোম্পানির প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, বড়পুকুরিয়ার মতো আন্ডারগ্রাউন্ড পদ্ধতির পরিবর্তে ফুলবাড়ীতে উন্মুক্ত পদ্ধতি নির্বাচন করার কারণ হলো এর ভূতাত্ত্বিক গঠন। উক্ত আলোচনায় বড়পুকুরিয়া নিয়ে আশি ও নব্বইয়ের দশকে ব্রিটিশ কনসাল্টিং ফার্ম যেসব গবেষণা করেছে[৩৬] তার কোনো আলোচনা নেই।

এই আলোচনা করতে গেলে ঐ ফার্ম কেন বড়পুকুরিয়ায় আন্ডারগ্রাউন্ড পদ্ধতি সুপারিশ করল তা যুক্তি ও উপাত্ত দিয়ে খণ্ডন করতে হবে বিধায় সে পথে পা বাড়ায়নি খনি কোম্পানি। এর পরিবর্তে বড়পুকুরিয়া খনি তৈরির সময় যেসব দুর্ঘটনা ঘটেছে তাকেই সামনে হাজির করেছে তার সিদ্ধান্তের সপে। তবে কেন সেই দুর্ঘটনা ঘটেছে সেদিকে কোনো নজর দেয়নি। তা না করে বরং জার্মানির উন্মুক্ত খনিকে আদর্শ কেস হিসেবে হাজির করেছে। খনি কোম্পানি ও তার লবিস্টদের যুক্তি বাতিল করে বাংলাদেশের জ্বালানি মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণ ও অনেক স্বাধীন বিশেষজ্ঞ ফুলবাড়ীকে জার্মানির আদলে বিচার করাকে বাতিল করেছেন।[৩৭] কোম্পানির প্রতিবেদনে এক পৃষ্ঠার এই সংক্ষি আলোচনা আমার কাছে জুতসই মনে হয়নি। তবে এসব কারিগরি বিষয়ের মধ্যেই আসল কথাটি বেরিয়ে এলো। ঐ আলোচনার একেবারে শেষে কোম্পানি উল্লেখ করেছে যে আন্ডারগ্রাউন্ড পদ্ধতিতে খনি করলে কয়লা উৎপাদনের ও বিপণনের যে টার্গেট ও পরিকল্পনা তারা করেছে তা বাস্তাবায়িত হবে না। থলের বিড়াল বেরিয়ে এলো! ভূতাত্ত্বিক গঠন ও কারিগরি বিষয়াবলি আসলে অজুহাত মাত্র; মূল বিষয় মুনাফার উচ্চ হার। আমি আগেই উল্লেখ করেছি যে ২০০৪ সালের শুরুর দিকে কোম্পানি তার পূর্বের পরিকল্পনা বাতিল করে উন্মুক্ত পদ্ধতিতে অনেক কয়লা উত্তোলন করে প্রায় সব কয়লা রপ্তানি করে প্রচুর মুনাফা অর্জন করতে চায়। অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের নামে কর্পোরেট এজেন্ডার পরিবেশনে ভরপুর কোম্পানির এসব প্রতিবেদন। সে জন্য খনি কোম্পানির সমস্ত প্রতিবেদনের নিরপে বিশ্লেষণ প্রয়োজন; প্রয়োজনে

সম্পূর্ণ স্বাধীন সংস্থাকে দিয়ে এসব পর্যালোচনা করা দরকার।

আমি জোর দিয়ে বলতে চাই যে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের নিরিখে নয়, বরং মুনাফার উচ্চ হারের তাড়না কোম্পানিকে উন্মুক্ত পদ্ধতি নির্বাচন করার ক্ষেত্রে প্ররোচিত করেছে। এ বিষয়টি আরো জোরালোভাবে তুলে ধরার জন্য আমি ২০০৫ সালের মার্চ মাসে প্রচারিত কোম্পানির ইনফরমেশন শিট নং (১-৪)-কে দলিল হিসেবে হাজির করতে চাই।[৩৮] কোম্পানি ফিসিবিলিটি স্টাডি শুরু করেছে উন্মুক্ত খনি করা যাবে কি না তা দেখার জন্য। ২০০৪ সালের শুরুতে কয়লার দাম বাড়ার কারণে প্রচুর মুনাফার হাতছানিতে আগেই উন্মুক্ত খনি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। দুই বছর মেয়াদি (২০০৪-০৫) ফিসিবিলিটি স্টাডির শেষের দিকে এসে মাইনিং পদ্ধতি নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা শুরুতে বললেও ২০০৫ সালের মার্চ মাসে এসে দেখা গেল যে উন্মুক্ত পদ্ধতিতে কিভাবে খনি করা যাবে তা নিয়েই এই ফিসিবিলিটি স্টাডি। খনির উন্নয়নের প্রস্তাবনা দাখিলের বেশ আগেই কোম্পানি খনি পদ্ধতি ঠিক করে গবেষণায় নেমেছে। ফলে এ বিষয়ে খনি কোম্পানি এবং তার পক্ষে তদবিরকারীদের বক্তব্যে আস্থা রাখা যায় না। বাংলাদেশ সরকারের ২০০৬ ও ২০১২ সালে গঠিত বিশেষজ্ঞ প্যানেলও এ নিয়ে নানা ত্রুটি চিহ্নিত করেছে। বিলম্বে হলেও জ্বালানি মন্ত্রণালয় ২০১৫ সালের জুলাই মাসে নতুন করে ফিসিবিলিটি স্টাডি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ফুলবাড়ীর গণপ্রতিরোধ জ্বালানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় নতুন মাত্রা যোগ করল।

> ২০০৪ সালের শুরুর দিকে কোম্পানি তার পূর্বের পরিকল্পনা বাতিল করে উন্মুক্ত পদ্ধতিতে অনেক কয়লা উত্তোলন করে প্রায় সব কয়লা রপ্তানি করে প্রচুর মুনাফা অর্জন করতে চায়। অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের নামে কর্পোরেট এজেন্ডার পরিবেশনে ভরপুর কোম্পানির এসব প্রতিবেদন।

৬.

এবার বাংলাদেশে কয়লা খাতের নীতিনির্ধারণে মতার জটিল চক্র কিভাবে ফুলবাড়ীর প্রতিরোধের সাথে সম্পর্কিত তা নিয়ে একটু আলোকপাত করব। নাইকো কেলেঙ্কারিতে ধরাশায়ী হয়ে জ্বালানিমন্ত্রী দায়িত্ব হারানোর পর তৎকালীন সরকার ২০০৫ সালের জুন মাসে নতুন জ্বালানি উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ দেন বিনিয়োগ বোর্ডের তখনকার প্রধানকে। উপদেষ্টা দায়িত্ব নিয়েই দৃষ্টি দেন বাংলাদেশের কয়লা খাতে এবং কয়লা উত্তোলনের বিষয়ে দিকনির্দেশনার জন্য একটি জাতীয় কয়লানীতি তৈরির ঘোষণা দেন। একই সাথে তিনি বাংলাদেশের বিদ্যমান খনি ও খনিজ বিধিমালা হালনাগাদ করার জন্য জ্বালানি মন্ত্রণালয়ে একটি কমিটি তৈরি করেন। জুলাই মাসের শেষের দিকে তিনি মিডিয়ার সাথে আলাপকালে জানিয়েছেন যে কয়লা উত্তোলনের জন্য নির্ধারিত রয়্যালটির হার অত্যন্ত কম; এর সংশোধনের প্রয়োজন মনে করে তিনি খনি ও খনিজ বিধিমালা হালনাগাদের তাগিদ দেন। এখানে উল্লেখ করা দরকার যে কয়লা উত্তোলনের জন্য নির্ধারিত রয়্যালটির হার সম্পর্কে বাংলাদেশে প্রথম রাজনৈতিক প্রশ্ন উত্থাপিত হয় ফুলবাড়ীতে, যেখানে স্থানীয় মানুষ খনি কোম্পানির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ তৈরির প্রস্তুতি নিচ্ছিল। জ্বালানি উপদেষ্টা দায়িত্ব নেওয়ার আগেই ২০০৫ সালের ১৬ এপিল এক জনসভায় এবং এ সম্পর্কিত প্রেস ব্রিফিংয়ে দাবি তোলা হয় যে মাত্র ৬ শতাংশ রয়্যালটির হারে বাংলাদেশের জাতীয় স্বার্থ রক্ষা হবে না।[৩৯] কয়লানীতি প্রসঙ্গে মিডিয়ার সাথে আলাপকালে জ্বালানি মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ রয়্যালটির হার ও জাতীয় স্বার্থ নিয়ে একই অভিমত ব্যক্ত করেন।[৪০]

২০০৬-২০১০ সালে কয়লানীতির প্রস্তাবিত ১০টি খসড়ায় রয়্যালটির হার নিয়ে নানা কথা বলা হলেও, এ বিষয়ে নানা আন্দোলন-সংগ্রাম হলেও এবং জনপরিসরে নানা তর্ক-বিতর্ক হওয়া সত্ত্বেও খনি ও খনিজ বিধিমালা হালনাগাদ করার জন্য গঠিত জ্বালানি মন্ত্রণালয়ের কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী ২০১২ সালের মে মাসে যে নতুন খনি ও খনিজ বিধিমালা জারি হয়েছে তাতে রয়্যালটির হার অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। তাহলে প্রশ্ন জাগে, ২০০৫ থেকে শুরু হয়ে কয়লা বিষয়ে যে আন্দোলন, আলোচনা, তর্ক চলছিল তার কী প্রতিফলন দেখা গেল এ আইনে? কয়লানীতির নানা খসড়ায় রয়্যালটি সংক্রান্ত বিভিন্ন ফর্মুলা নিয়ে বিশেষজ্ঞ ও নীতিনির্ধারকদের মধ্যে যে তর্ক-বিতর্ক হয়েছে তা কি কাজে লেগেছে? আমি যে বিষয়ের দিকে দৃষ্টি দিতে চাই তা হলো, কয়লানীতি নিয়ে বাংলাদেশে চলমান রাজনীতির কফিনে শেষ পেরেক ঠোকা হয়েছে এই নতুন খনি ও খনিজ বিধিমালা জারির মাধ্যমে। বাংলাদেশে কয়লানীতি নিয়ে আলাপ-আলোচনা এত বেশি হয়েছে যে এর মূল আইনি কাঠামোর (খনি ও খনিজ বিধিমালা) দিকে কেউ খুব একটা নজর দেয়নি। তবে খনি কোম্পানি এ বিষয়ে সজাগ ছিল বলেই রয়্যালটির হার অপরিবর্তিত রেখে আইন সংশোধন করা হয়েছে। কেননা চুক্তি অনুযায়ী কোম্পানির সাথে সব লেনদেন কিংবা ব্যবস্থাপনার নানা দিক নিয়ন্ত্রিত হবে এতৎসম্পর্কিত আইন দ্বারা, কয়লানীতি দ্বারা নয়। তাই আইনি বিধান কোম্পানির পক্ষে রাখার চেষ্টা তো সংগত কারণে থাকবেই।

এখানে উল্লেখ করা দরকার যে সম্ভাব্য বিনিয়োগকারীদের উদ্দেশে কোম্পানি যে উপস্থাপনা প্রচার করেছে তাতে জোর দিয়েই উল্লেখ করা হয়েছে যে উচ্চ মুনাফা নিশ্চিত করার জন্য খনির মেয়াদকালীন বাংলাদেশ সরকারের কাছ থেকে নিম্ন হারের রয়্যালটির নিশ্চয়তা তাদের আছে। এর প্রতিফলন দেখা গেল ২০১২ সালের খনি ও খনিজ বিধিমালায়। মনে রাখা দরকার যে কয়লানীতি একটা দিকনির্দেশনা মাত্র, এটি কোনো আইনি কাঠামো নয়। কাড়িত কয়লানীতি পেলেও তা জ্বালানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় আইনি রক্ষাকবচ হবে না। তা করতে হলে জ্বালানি খাতের আন্দোলনকারীদের দুটি প্রক্রিয়ার দিকে নজর দিতে হবে– ক. কাঙ্খিত কয়লানীতি একই নামে সংসদে আইন হিসেবে পাস করতে হবে (বাংলাদেশে এর নজির আছে, সাম্প্রতিক উদাহরণ ২০১০ সালে তৈরি পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ পলিসি, যা একই নামে ২০১৫ সালে আইন হিসেবে সংসদে পাস হয়); কিংবা খ. কাঙ্খিত কয়লানীতি একটি পৃথক অধ্যায় হিসেবে বাংলাদেশের খনি ও খনিজ বিধিমালা ২০১২-তে সংযুক্ত করে সংশোধন করতে হবে।

৭.

বাংলাদেশে খনি বিষয়ক আলোচনায় ও নানা বিতর্কে একচ্ছত্র আধিপত্য বজায় রেখেছেন ভূতত্ত্ববিদ ও জ্বালানি প্রকৌশলীগণ। তাই সরকারের নানা বিশেষজ্ঞ প্যানেলে এঁদের সংখ্যাধিক্য দেখা যায়। কিন্তু জ্বালানি বিষয়টা তো শুধুমাত্র ভূতত্ত্ববিদ বা জ্বালানি প্রকৌশলীর বিষয় নয়, তা বাংলাদেশে এখনো প্রতিষ্ঠিত হয়নি। খনি বিষয়ক আলোচনা কারিগরি দিকে ঝুঁকে আছে বলে মূলধারার আলোচনায় এর রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক দিক অনেকটা উপেক্ষিত। তবে আশার কথা এই যে ২০০৫-২০১৫ সময়ের স্থানীয় গণপ্রতিরোধ ও জাতীয় পর্যায়ে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন সামাজিক আন্দোলনের বলিষ্ঠ উপস্থিতি এই উপেতি বিষয়কে সামনে এনেছে। ২০১৫ সালে বাংলাদেশের একজন

ভূতত্ত্ববিদ আমার গবেষণার বিষয়ে শুনে খুবই অবাক হলেন।[৪১] তাঁর বক্তব্য ছিল এরকম: জ্বালানি নিয়ে সমাজবিজ্ঞানে গবেষণার কী বিষয় আছে? এ তো শুধুই কারিগরি বিষয়! ২০১৩ সালে ঢাকায় একজন উঁচুমাপের জ্বালানি প্রকৌশলীর সাথে আলাপ করতে গিয়ে দেখলাম যে তিনি ফুলবাড়ী খনি বিষয়ে স্থানীয় জনগণের প্রতিরোধ আন্দোলনকে গুরুত্ব দেন, আবার একই সাথে মনে করেন যে কয়েকটি কারিগরি বিষয়ের সমাধান হলে খনি কোম্পানির প্রস্তাবিত পদ্ধতিতে কোনো সমস্যা নেই।[৪২] এই কারিগরি বিষয়াবলি জনগণের প্রতিরোধ আন্দোলনের সাথে সংঘর্ষপূর্ণ হলেও তাঁর ঝোঁক কারিগরি বিষয়ের দিকে।

অন্যদিকে সামাজিক বিজ্ঞানের যে শাখার বিশেষজ্ঞদের কিছুটা উপস্থিতি এই আলোচনায় দেখা যায় তাঁরা হলেন অর্থনীতিবিদ। তবে তাঁরা বিষয়টিকে চাহিদা-সরবরাহের সরলীকৃত কাঠামোয় দেখতে অভ্যস্ত। সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক প্রপঞ্চ এই আলোচনায় জায়গা পায় না। বাংলাদেশের একজন প্রথিতযশা অর্থনীতিবিদ ২০১০ সালে ফুলবাড়ী খনি নিয়ে চলমান সংকট সমাধানের জন্য এক অভিনব দাওয়াই হাজির করলেন।[৪৩] তাঁর মতে, দেশের বিদ্যুৎ সংকট লাঘবের জন্য অধিক পরিমাণে কয়লা উত্তোলন অত্যাবশ্যক। তাই স্থানীয় জনগণকে উচ্ছেদের ফলে তারা যাতে একেবারে বেহাল দশায় না পড়ে সে জন্য উচ্ছেদ হওয়া প্রত্যেক পরিবারের একজনকে খনিতে কর্মের ব্যবস্থা করে দিতে সুপারিশ করেছেন। এ ছাড়াও উচ্ছেদের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার যাতে খনি কোম্পানির শেয়ারের অংশ পায় তার ব্যবস্থা করার কথা তিনি বলেছেন। এতে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের একদিকে মতায়ন হবে, অন্যদিকে তারা উন্নয়নের মালিকানার অংশীদারও হবে। এইসব দাওয়াই যে কতটা বাস্তবতা বিবর্জিত তা বাজার অর্থনীতির ছকে তৈরি তাত্ত্বিক কাঠামোয় ধরা পড়েনি। আমি প্রশ্ন উত্থাপন করতে চাই যে এই দাওয়াই তৈরির আগে এঁরা কি ফুলবাড়ী বিষয়ে নানা আলোচনার কোনো কিছু মনোযোগ সহকারে পাঠ করেছেন? এঁরা তা করেননি তার প্রমাণ পেলাম ২০১২ সালে ইউরোপিয়ান কমিশনের জন্য ঢাকার একটি নামকরা থিংক ট্যাংকের এক সিনিয়র গবেষকের লিখিত এক গবেষণা প্রতিবেদনে।[৪৪] ২০০৫ সাল থেকে ফুলবাড়ী খনি বিষয়ে এ সম্পর্কিত আন্দোলনের নানা প্রকাশনা বা স্থানীয় মানুষের নানা বক্তব্যের কোনো প্রতিফলন এই প্রতিবেদনে চোখে পড়েনি। উপরন্তু যা দেখতে পেলাম তা হলো খনি কোম্পানির প্রদত্ত লাভের হিসাবের পুনরাবৃত্তি। অথচ একজন অর্থনীতিবিদের হাতে এসবের একটা নির্মোহ বিশ্লেষণ জনপরিসরে আলোচনাকে উজ্জীবিত করতে পারত। ২০১০ সালে বাংলাদেশ সরকারের সাথে সংশ্লিষ্ট এক অর্থনীতিবিদ বললেন যে স্থানীয় মানুষ জমির দাম ও ক্ষতিপূরণ একটু বেশি পেলে এমনিতেই সরে পড়বে।[৪৫] এসব আজগুবি ভাবনার অসারতা ফুলবাড়ীর জনগণ প্রমাণ করেছে। তবে এখানে উল্লেখ করা দরকার যে এসব মূলধারার অর্থনীতিবিদের ভিড়ে ফুলবাড়ী খনি তথা কয়লা বিষয়ে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির গ্যাস-তেল-কয়লা বিষয়ক নাগরিক কমিশন ২০০৫-এর জুলাই থেকে ২০০৯-এর শুরু পর্যন্ত শক্তিশালী ভূমিকা পালন করেছে।[৪৬] অবশ্য এরপর তাঁরা চুপসে গেলেন।

এইসব দাওয়াই যে কতটা বাস্তবতা বিবর্জিত তা বাজার অর্থনীতির ছকে তৈরি তাত্ত্বিক কাঠামোয় ধরা পড়েনি। আমি প্রশ্ন উত্থাপন করতে চাই যে এই দাওয়াই তৈরির আগে এঁরা কি ফুলবাড়ী বিষয়ে নানা আলোচনার কোনো কিছু মনোযোগ সহকারে পাঠ করেছেন? এঁরা তা করেননি তার প্রমাণ পেলাম ২০১২ সালে ইউরোপিয়ান কমিশনের জন্য ঢাকার একটি নামকরা থিংক ট্যাংকের এক সিনিয়র গবেষকের লিখিত এক গবেষণা প্রতিবেদনে।

সব শেষে বলা দরকার যে জ্বালানি সম্পদের ব্যবস্থাপনায় নীতিনির্ধারণের ক্ষেত্রে মূলধারার অর্থনীতি, ভূতত্ত্ব এবং জ্বালানী প্রকৌশলের আওতার বাইরেও বাংলাদেশের নীতিনির্ধারকদের মনোযোগ দিতে হবে। উন্নয়নশীল দেশগুলো বৈশ্বিক পুঁজির বেড়াজালে প্রবেশের ফলে জ্বালানি ও পুঁজির মধ্যকার জটিল সম্পর্কের বিশ্লেষণের জন্য আমাদের যেতে হবে মানবিক ও সামাজিক বিজ্ঞানের কাছে। একটা দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো কিভাবে জ্বালানি বিষয়ে সিদ্ধান্ত তৈরির প্রক্রিয়ায় অনুঘটক হিসেবে কাজ করে কিংবা উদারনৈতিক পুঁজিবাদী বিশ্বায়ন ব্যবস্থায় জ্বালানি বিষয়ে বহুজাতিক কোম্পানি ও উন্নয়ন সহযোগীদের রাজনীতি জ্বালানি সম্পদের ব্যবস্থাপনায় কিভাবে প্রভাব বিস্তার করে তার ব্যাখ্যা ভূতত্ত্ব কিংবা জ্বালানি প্রকৌশলশাস্ত্রে মিলবে না। তাই কারিগরি বিদ্যা এবং মূলধারার অর্থনীতির আলোকে কোনো কিছু ইতিবাচক দেখলেই যে তা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে তা ঠিক নয়; এ নিয়ে সামাজিক বিজ্ঞানের দ্বারস্থ হওয়া দরকার। ফুলবাড়ীর গণপ্রতিরোধ এ বিষয়ের দিকেই ইঙ্গিত দেয়। মূলধারার অর্থনীতি, ভূতত্ত্ব এবং প্রকৌশলশাস্ত্রকেন্দ্রিক জ্বালানী বিষয়ক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের সীমাবদ্ধতা বোঝার জন্য আমি একটি উদাহরণ তুলে ধরে এই আলোচনা শেষ করছি।

পঞ্চাশের দশকে পার্বত্য চট্টগ্রামে কর্ণফুলী নদীতে ড্যাম দিয়ে যে জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরি হয়েছে তা ফুলবাড়ীর প্রতিরোধ বোঝার জন্য সহায়ক। তৎকালীন পাকিস্তান সরকার মার্কিন সরকারি সাহায্য সংস্থার আর্থিক ও কারিগরি অনুদানে মাত্র ৮০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য এই প্রকল্প বাস্তবায়ন করে। প্রকল্পের ফলে ১০০০০০ মানুষ উচ্ছেদ হয়, যাদের বেশির ভাগ ভারতের অরুণাচলে গিয়ে বসতি স্থাপন করে। এদের কেউ সামান্য পরিমাণ তিপূরণ পায়নি। উৎপাদিত বিদ্যুতের মাত্র ১ শতাংশ ঐ অঞ্চলে ব্যবহৃত হয়েছে। চট্টগ্রামের শহরাঞ্চলের বিদ্যুৎ সুবিধা বাড়ানোর উদ্দেশ্যে ড্যাম এলাকার ৪০ শতাংশ কৃষিজমি হারিয়ে যায় ড্যামের ফলে সৃষ্ট আজকের 'নয়নাভিরাম' কাপ্তাই লেকের তলদেশে।[৪৭] প্রতিরোধের কিছু চেষ্টা হলেও তা টেকেনি। সাবেক চাকমা রাজা তাঁর স্মৃতিকথায় জানান, প্রতিরোধ তৈরি করতে না পেরে নীরব দর্শক হিসেবে জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রের নির্মাণ ও তার ভয়াবহ পরিণতি তাঁদের দেখতে হয়েছে।[৪৮] এত বেশি মানুষের উন্নয়নের বলি হয়ে দেশান্তরি হওয়ার ভয়াবহতা, যা স্থানীয় বয়ানে 'বর পরাং'[৪৯] নামে পরিচিত, জ্বালানি সম্পর্কিত মূলধারার আলোচনাকে মারাত্মকভাবে প্রশ্নবিদ্ধ করে। ফুলবাড়ীর গণপ্রতিরোধ এ বিষয়টিকে নতুনভাবে আমাদের সামনে হাজির করেছে। বাংলাদেশ সরকারের জ্বালানিক্ষেত্রের নীতিনির্ধারকগণ এসব বিষয়ে নির্মোহভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করে জনস্বার্থে সিদ্ধান্ত নেওয়ার তাগিদ অনুভব করলেই ফুলবাড়ীর জনগণের প্রতিরোধ আলোর মুখ দেখবে।

ওমর ফারুক: বাংলাদেশের জ্বালানি সম্পদের রাজনীতি বিষয়ে টরন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগে গবেষণারত পিএইচডি শিক্ষার্থী
ই-মেইল: omarsoc@gmail.com

পাদটীকা

১. Asia Energy PLC, Phulbari Coal Project: Environmental and Social Impact Assessment (Volume 1, Main Report), এপ্রিল ২০০৬

২. Industrial Energy Efficiency Finance Program: Sector Overview, 2011

৩. BBC World Service, ১২ জুলাই ২০০৬

৪. Dhaka Tribune-এ প্রকাশিত প্রতিবেদন, ৭ ডিসেম্বর ২০১৪

5. GCM Resources PLC: Annual Report and Accounts 2015

৬. Asia Energy PLC: Audited Preliminary Announcement for the Period ended June ২০০৪, ৩ নভেম্বর ২০০৪

৭. Asia Energy PLC: The Phulbari Coal Project, নভেম্বর ২০০৪

৮. বিএইচপির প্রধান দপ্তরের সাথে লেখকের ই-মেইল যোগাযোগ, ২ ফেব্রুয়ারি ২০১৫

৯. ই-মেইল ও টেলিফোনে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার সাথে লেখকের আলাপ, ৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৫

১০. New Age, ১৪ সেপ্টেম্বর ২০০৮ এবং Daily Star, ৩০ মে ২০১০-এ নজরুল ইসলামের লিখিত নিবন্ধ

১১. Deepgreen Minerals Corporation Limited I Cambrian Mining PIC-র বিভিন্ন প্রতিবেদন এবং The Economist, Financial Times সহ আরো নানা সূত্র থেকে BHP ও Asia Energy-র ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড সম্পর্কিত প্রতিবেদন থেকে প্রাপ্ত তথ্যাবলি

১২. ফুলবাড়ী কয়লাখনি প্রকল্পের উন্নয়ন পরিকল্পনা মূল্যায়নের জন্য বাংলাদেশ সরকার গঠিত বিশেষজ্ঞ কমিটির প্রতিবেদন, ২০০৬

১৩. এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে আমার মাঠ গবেষণার সময় নানাভাবে চেষ্টা করেও খনি কোম্পানির ঢাকা অফিসের কোনো কর্মকর্তার সাক্ষাৎকার নেওয়ার সুযোগ মেলেনি। এরপর ২৫ নভেম্বর ২০১৪, ২১ মার্চ ২০১৫, ১১ জুন ২০১৫ ঢাকা ও লন্ডন অফিসে ই-মেইলে যোগাযোগ করেও কোনো জবাব পাওয়া যায়নি

১৪. Daily Star-এ প্রকাশিত প্রতিবেদন, ২০ সেপ্টেম্বর ২০০৬

১৫. কানাডার Toronto Star, Globe and Mail, David Suzuki Foundation, TV Ontario, CBC News, , Huffington Post Canada-র নানা প্রতিবেদন থেকে প্রাপ্ত তথ্যাবলি

১৬. বাংলাদেশ সরকারের গেজেট, ১ জুন ২০০৬, পৃষ্ঠা ৬৪৩

১৭. ২০০৯ সালে ফুলবাড়ীতে মাঠ গবেষণাকালে সংগৃহীত তথ্যাবলি

১৮. Dhaka Tribune-এ প্রকাশিত প্রতিবেদন, ৪ এপ্রিল ২০১৬

১৯. Rashid, Ahmed K. 2014. 'The role of Bureaucracy in Policymaking in Bangladesh'. Asia Pacific Journal of Public Administration 36 (2): 150-161 Ges Zafarullah, Habib. 2013. 'Bureaucratic Culture and the Social-Political Connection: The Bangladesh Example'. International Journal of Public Administration 36 (13): 932-939

২০. Daily Star-এ প্রকাশিত অধ্যাপক মো. খালেকুজ্জামানের নিবন্ধ, ১ জুন ২০১০

২১. Salahuddin M. Aminuzzaman. 2013. 'Public Policy Processes and Citizen Participation in Bangladesh'. PP. 213-235 in Public Administration in South Asia, edited by Meghna Sabharwal and Evan M. Berman. Boca Raton, FL: CRC Press.

২২. এ বিষয়ে আমি বিশদভাবে অনুসন্ধান করেছি, যা এই প্রবন্ধে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি

২৩. বাংলাদেশ সরকারের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৪-১৫

২৪. জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের জন্য আইআইএফসি (Investment Infrastructure Facilitation Center) প্রণীত (প্রকল্প নং-৪০০১৩) খসড়া কয়লানীতি, ১ ডিসেম্বর ২০০৫

২৫. কানাডার Globe and Mail-এ প্রকাশিত প্রতিবেদন, ২৪ জুন ২০১১

২৬. প্রথম আলোতে প্রকাশিত প্রতিবেদন, ২৫ মে ২০১৬

২৭. ফুলবাড়ী কয়লাখনি প্রকল্পের উন্নয়ন পরিকল্পনা মূল্যায়নের জন্য বাংলাদেশ সরকার গঠিত বিশেষজ্ঞ কমিটির প্রতিবেদন, ২০০৬ এবং কয়লা উত্তোলন পদ্ধতি সুপারিশ করার জন্য বাংলাদেশ সরকার গঠিত বিশেষজ্ঞ কমিটির প্রতিবেদন, ২০১২

২৮. প্রথম আলোতে প্রকাশিত প্রতিবেদন, ২২ জুলাই ২০১৫

২৯. বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাত নিয়ে বাংলাদেশের পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের নানা প্রতিবেদন ২০০৫-২০১৬

৩০. Dhaka Tribune-এ প্রকাশিত প্রতিবেদন, ১৯ জুন ২০১৬

৩১. বাংলাদেশ সরকারের ২০১২-এর প্রতিবেদন, Rio+20: National Report on Sustainable Development

৩২. ২০০৫ থেকে অদ্যাবধি বাংলাদেশের নানা দৈনিক পত্রিকায় ভূতত্ত্ববিদ ও জ্বালানি প্রকৌশলীদের লেখা বেশির ভাগ নিবন্ধে এর প্রমাণ পাওয়া যায়

৩৩. Phulbari: Coal Capital of Bangladesh

৩৪. তুষার আবদুল্লাহ, 'এনার্জি রিপোর্টিং' ঢাকা : আদর্শ, ২০১৬

৩৫.Asia Energy PLC, Phulbari Coal Project: Environmental and Social Impact Assessment (Volume 1, Main Report), এপ্রিল ২০০৬

৩৬. বদরুল ইমাম, ২০১৩, 'Energy Resources of Bangladesh', Dhaka: University Grants Commission

৩৭. New Age-এ প্রকাশিত প্রতিবেদন, ২৪ আগস্ট ২০১৫

৩৮. ২০০৯ সালে ফুলবাড়ীতে মাঠ গবেষণাকালে সংগৃহীত তথ্যাবলি

৩৯. প্রেস ব্রিফিং, জাতীয় কৃষক ক্ষেতমজুর সমিতি, ১৭ এপ্রিল ২০০৫

৪০. Daily Star-এ প্রকাশিত প্রতিবেদন, ৭ সেপ্টেম্বর ২০০৫

৪১. লেখকের সাথে টেলিফোন সাক্ষাৎকার, ১৫ মার্চ ২০১৫

৪২. লেখকের সাথে টেলিফোন সাক্ষাৎকার, ২২ আগস্ট ২০১৩

43. রেহমান সোবহান, 2010, Challenging the Injustice of Poverty, New Delhi: Sage

৪৪. অধ্যাপক মুস্তাফিজুর রহমান, ২০১২ Sustainable Exploitation of Bangladesh's Coal Resources: An Intractable (?) Policy Dilemma

৪৫. প্রথম আলোতে প্রকাশিত প্রতিবেদন, ২ আগস্ট ২০০৯

৪৬. ২০০৯ সালে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি থেকে সংগৃহীত দলিলপত্র

৪৭. দীপক সিং, ২০১০, 'Stateless in South Asia: The Chakmas between Bangladesh and India', New Delhi: Sage

৪৮. মেঘনা গুহঠাকুরতা ও ভিলেম ভ্যান সেন্ডেল, ২০১৩, 'The Bangladesh Reader: History, Culture, Politics'. Durham: Duke University Press

৪৯. হরিকিশোর চাকমা, তাপস চাকমা, প্রেয়সী দেওয়ান, মাহফুজউল্লাহ, ১৯৯৫, Bara Parang: The tale of the development refugees of the Chittagong Hill Tracts. Dhaka: Centre for Sustainable Development, পৃষ্ঠা ২০।